কার্টুনিস্টের চোখে দেখা

চণ্ডী লাহিড়ী

It is seeing which establishes our place in the surrounding world.

ভারত-চীন সংঘর্ষের কিছুদিন পরের ঘটনা। আমার এক সাংবাদিক সহকর্মীর সঙ্গে কয়েকটি অপরিচিত যুবক ঘরে এলেন। আমায় তাঁরা গুণীজন সম্বর্ধনা দেবেন। বয়সে তখন তণ। আমি একজন গুণী হিসাবে সম্বর্ধনা পাব - এরকম একটা প্রস্তাব শোনা মাত্র ছত্রিশ ইঞ্চি বুক একশো ছত্রিশ ইঞ্চি হয়ে গেল। আমি আর মানুষ নই, আমি বেলুন। আমি গুণী। আমি কলকাতার বড় দৈনিকে যে কার্টুন আঁকি সেটা হাজার হাজার পাঠক দেখে। আলোচনা করে। এতএব আমি গুণী। আর ওই গুণীজন সভায় সভাপতিত্ব করবেন আনন্দবাজারের প্রতিযোগী পত্রিকা যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানস্থল বরানগর। আমি একা নই। আমার সঙ্গে একাসনে বসে গুণীজন সম্বর্ধনা পাবেন অভিনেতা বিকাশ রায়, খেলোয়াড় শৈলেন মান্না, সাঁতা আরতি সাহা। এতগুলি বিখ্যাত মানুষের পাশে বসব! কুয়োর ব্যাঙ আমি ফুলে উঠলাম।
অনুষ্ঠানস্থল বরানগর। মেসে থাকতাম। সেখান থেকে গাড়ি করে অনুষ্ঠানস্থলে গেলাম। চা-জলযোগ সারা হল। মানপত্র পাঠ হল। তারপর শু হল বিবেকানন্দবাবুর ভাষণ। সে ভাষণ চলছে তো চলছেই।
একটি তণ যুবক হাতে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে গেল। তাতে লেখা - বাইরে আসুন - বিকাশ রায়। দেখি পাশে আরতি সাহা, শৈলেন মান্না নেই। ছোট টয়লেটের নাম করে আমিও বেরিয়ে পড়লাম ছেলেটির সঙ্গে। একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল বা বটগাছের অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিকাশ রায় বললেন -বাড়ি ফেরার ইচ্ছে আছে?
বললাম - যারা উদ্যোক্তা তারা গাড়ি করে পৌঁছে দেবে বলেছে।
বিকাশ রায় বললেন - আপনি নতুন এ লাইনে। সবে গুণী হয়েছেন এরা নিয়ে যায় অনুষ্ঠানের আগে। ফেরার পথে কেউ দায়িত্ব নেয় না। আমার গাড়িতে এখনই উঠে পড়ুন। নইলে রাত্রে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। অনুষ্ঠানস্থলে আর ফিরলাম না। বিকাশ রায়ের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে এলাম।
ত্রিশ বছর পর দূরদর্শনে প্রোগ্রাম করতে গিয়ে স্টুডিওর মধ্যে আরতি সাহার সঙ্গে দেখা। আমার মাথায় টাক। চুলের যে কটি অবশিষ্ট সেগুলি সাদা। আরতি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে যখন সংবাদের শিরোনাম তখন সে তন্বী। তণমহলে সে হার্ট থ্রব। এখন বৃদ্ধা, স্থুলাঙ্গী। দূরদর্শনে সেদিন তার সঙ্গে প্রোগ্রাম করতে এসেছিলেন আর এক প্রবীণা। আমরা দুই বুড়ো-বুড়ি যখন চেঁচিয়ে হাসছি তখন এই প্রবীণা ব্যাপারটি বুঝতে পারছিলেন না। আরতি পরিচয় করিয়ে দিলেন। যৌবনে এই মহিলা বুকে হাতি তুলতেন - নাম রেবা রক্ষিত। যোগ সম্রাট বিষ্ণুচরণ ঘোষের প্রিয় ছাত্রী। যৌবনে অসামান্যা সুন্দরী এবং দেহী। যুবকদের ভয় ছিল, রেবাকে প্রেম নিবেদন করতে গেলে সেই যুবকের চোয়ালে কোন দাঁত থাকবে না। রেবার বুকে হাতি তোলা নিয়েও আমি কার্টুন করেছি। রেবাকে আমাদের গুণী সম্বর্ধনার গল্পটা বললাম।
গুণী সম্বর্ধনা নামক অনুষ্ঠানে গাড়ি চেপে গিয়ে পায়ে হেঁটে ফিরেছেন এমন অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে। শুতেই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন বিকাশ রায়। পরে যতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমায় কাঁচা গুণী বলে সম্বোধন করতেন।
নানা কেরামতে ওস্তাদ সেই অদৃশ্য দেবতা যিনি মাঝ দরিয়ায় জাল ফেলে ডাঙ্গায় বসে টানেন, তিনি তাঁর নতুন কেরামতি দেখালেন। আমায় গুণী করেই ক্ষান্ত হলেন না। আমায় গুণিন করলেন।

জরী অবস্থার ঠিক আগের কোন এক সময় এক জীর্ণবসন শীর্ণকায় ভদ্রলোক এলেন, আমার পাইকপাড়ার ফ্লাটে দেখা করতে। সঙ্গে ততোধিক কৃশকায় রোগজীর্ণ এক বালক। এতই অসুস্থ, সজীব না নির্জীব বোঝা দায়।

— আপনি গুণিন। আপনি মন্ত্র পড়ে হাত চালালে আমার ছেলেটা বেঁচে যাবে।

আমি হতবাক। ততোধিক হতবাক আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রীর পায়ে মাথা রেখে তার আকুল আকুতি, আমি যেন মন্ত্রবলে হ াত চালিয়ে তার ছেলেকে বাঁচাই। কৌতুহল বেড়ে গেল। আমার মধ্যে দুর্লভ রোগ নিরাময় শক্তি অদৃশ্যভাবে বিরাজ করছে তা নিজেই জানি না। অন্য কেউ জানলো কি করে।

প্রশ্ন করে জানলাম- চিৎপুরের রবীন্দ্র কাননের পূর্ব কোণে বামাক্ষেপা সাধন সঙ্ঘ নামক গঞ্জিকাসেবীদের একটি প্রতিষ্ঠান অ াছে। দু-একজন গেয়াধারী সাধু ছাড়াও সেখানে গৃহী ভক্তরা নিত্য যাতায়াত করেন। গঞ্জিকা সেবনান্তে কেউ কেউ ধর্মে াপদেশ দেন। এদেরই একজন আনন্দবাজারের নিয়মিত পাঠক। গঞ্জিকার ঘোরে তিনি বলেছিলেন - যে-শিল্পী এত সুন্দর কার্টুন আঁকেন, মন্ত্রী রাজ্যপাল পুলিশ কারও পরোয়া করেন না, যিনি শত শত মানুষকে আনন্দ দেন তাঁর হাত ঈশ্বরের হ াত। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর ঘাড়ে যখন ভর করেন তখন তিনি ঈশ্বরের অংশ। তখনই তিনি কার্টুন আঁকেন।

সেই গঞ্জিকাসেবী গুরুর নির্দেশে এই লোকটি এসেছে আমার কাছে, পুত্রের রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়ে। লোকটিকে খুব বকল াম। আমার স্ত্রী তার ছেলেটিকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। অচিরে ছেলেটি মারা গেল সেখানে।

গুণীজন হতে পারিনি। গুণীনও হইনি, হতে চেয়েছিলাম কার্টুনিস্ট, হয়েছিলামও কার্টুনিস্ট। নবদ্বীপের মতো অতি ক্ষুদ্র এক শহরে জন্মে, পেডিগ্রি বর্জিত দারিদ্রসম্বল বালক আমি অজানা অচেনা মহানগরীতে যেটুকু অর্জন করেছি এবং যাদের সা ন্নিধ্য পেয়েছি তাতে অনায়াসে বলতে পারি, ধন্যোহং কৃতকৃতেহং। আমি ধন্য। আমি কৃতকৃতার্থ।

অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা থেকে রাতারাতি ইংরেজীতে রূপান্তরিত হল ঐ সময়েই /১৯১২- গগনেন্দ্রনাথও কার্টুন আঁ াকতে শুরু করলেন।

গগনেন্দ্র কার্টুন এঁকে প্রবাসীর রামানন্দবাবুর কাছে পাঠাতেন। রামানন্দবাবু অন্যান্য রঙ্গীন ছবি /অবনীন্দ্র, নন্দলাল, অসিত হালদার ইত্যাদি মূলধারার চিত্রকর- যেমন গুরুত্ব দিয়ে ছাপতেন, গগনেন্দ্রের রঙিন কার্টুনও সেই একই গুরুত্ব দিয়ে ছ াপতেন। রামানন্দু বাবু শুরু থেকেই রঙিন পেন্টিং এবং রঙিন কার্টুনকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন এবং বাংলা কার্টুনকে বিদগ্ধ মহলে পৌঁছে দেবার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিদেশি পত্রিকায় যে সব কার্টুন ছাপা হত, রাম ানন্দবাবু সেগুলিও ছাপতেন, কিন্তু লিড পিকচার ছিল গগনেন্দ্রর কার্টুন।

পিসিয়েল পেয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তৎসহ সমগ্র গান্ধী এবং সুভাষচন্দ্রের কাল। তৎসহ স্বাধীন ভারতের অনেকগুলি বৎসর। তিনি খুব অসম্মানের মধ্য দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে বিদায় নেন। মালিক তুষার কান্তি ঘোষ তাঁকে না জা নিয়েই দিল্লির শংকরের সঙ্গে চুক্তি করেন এহং পিসিয়েলের চাকরি থাকতেই, তাঁর ছবি বন্ধ করেন এবং শংকরের কার্টুন ছ াপতে শুরু করেন। তুষার-পুত্র তরুণকান্তি তখন মন্ত্রী। দিল্লীর কর্তাদের নেকনজরে পুত্রকে রাখার জন্য, স্নেহের ঘনিষ্ঠ শংকরের ছবি তুষারবাবু ছাপতে থাকেন। সবিনয়ে জানাই, এসব ঘটনার সময় কার্টুনের জগতে আমি সাবালক এবং পিসিয়েলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে সব ব্যাপারটা আমি জানি। ভালোই জানি। যাঁরা প্রায়ই প্রশ্ন করেন, বাংলায় ভালো ক ার্টুনিষ্ট হচ্ছে না কেন, তারা নিশ্চয়ই পিসিয়েলের এই করুণ পরিণতি থেকে জবাব পাবেন। নিজের কথা সাতকাহন করে বল ার আগে আমায় বাংলা কার্টুনের আর দুই অগ্রজের কথা বলতেই হবে। কবিওয়ালা যেমন শুরু করেন, সবার আগে বন্দি আমি গুরু চরণ্ঠ। গগন ঠাকুর এবং পিসিয়েল অর্থাৎ প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ীর কথা এসে পড়বেই। আমরা প্রত্যেকেই স্বপ্নে, চিন্ত ায় ও লেখাপড়ার ধারায় স্বতন্ত্র। কেউ কারও অনুসারী নই। গগনেন্দ্রের মৃত্যুর দুবছর আগেই পিসিয়েল কলকাতা এসে কার্টুন আঁকা শুরু করেছেন। ১৯৩৮ সালে গগনেন্দ্র মারা যান, শেষ দশ বছর বাক্‌শক্তি রহিত অবস্থায় ঠাকুর বাড়ির অন্দরে তিনি ছিলেন। পিসিয়েলের আগমন তিনি টের পাননি। আমি যখন আনন্দবাজারে কাজ শুরু করি, পিসিয়েল তখন নিজ কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে। আমার পারিবারিক ঐতিহ্য এমন কিছু মূল্যবান নয় যে ঐ দুজনের ধারে কাছে ঘেঁষতে পা রি। আমরা তিনজন তিনটি যুগের কার্টুনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও কার্টুনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি পূর্ণতার দিকে, আন্তর্জাতিক ম ানের দিকে। আমরা তিনজনেই চিত্রবিদ্যার সঙ্গে লেখাপড়ায় বৈদগ্ধ্যকে একত্রে মিলিয়েছি। পিসিয়েল এবং আমার, বা গগনেন্দ্র এবং পিসিয়েলের মধ্যবর্তী স্তরে অনেকেই এসেছেন এবং কার্টুন এঁকেছেন কিন্তু পাঠকমনে গভীর কোন দাগ ক

াটতে পারেন নি। অথচ এদের অনেকেরই ড্রইং খুব স্টাইলাইজড এবং আন্তর্জাতিক মানের। কিন্তু ড্রইং-এর চাকচিক্য ব াইরের চোখ ধাঁধায়। ছবিকেও সাময়িক ভাবে খুব কাছে টানে। কিন্তু ছবিকে মনে রাখতে সাহায্য করে তার ক্যাপসন। এই ক্যাপসনের মোড়ক যত সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন হবে, মনের গভীরে তত দাগ কাটবে।

গগনেন্দ্রনাথ পথ প্রদর্শক। তিনি যা দেবেন তাই অমৃত। ভালো-মন্দ বিচার, বা অন্যের সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ তাঁর ছিলনা। কার্টুন মূল চিত্রচর্চার এমন একটি শাখা যা এতদিন কেবল কালিঘাটের পটুয়াদের বিষয়বস্তু ছিল। কালিঘাটের পটুয়ারা সমাজে খুব সম্মানিত ছিলেন না। ইংরাজি কাগজে তখন কার্টুন ছাপা হচ্ছে, বিদেশী কাগজ থেকে পূনর্মুদ্রণ। গগনেন্দ্রের সময়টাও খুব বিপজ্জনক। ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট থেকে বাঁচতে আনন্দবাজারে যখন কার্টুন আঁকা শু করি তখন ভারতের রাজনৈতিক এবং তারই সূত্র ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পালা-বদলের কাল শু হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ কিন্তু যুদ্ধজনিত যে অভাব অনটন তার শেষ হয়নি। যুদ্ধ যত মানুষকে প্রাণে মারে, তার অনেক বেশি মানুষকে প্রাণের গভীরে মারে। ইউরোপে যারা যুদ্ধ করেছে, প্রবল দেশপ্রেমের তাড়নায় তারা লড়েছে। এক টুকরো পাঁউটি দশজনে ভাগ করে খেয়েছে, পরের দশদিন আদৌ খাওয়া জোটেনি। আমাদের দেশে যুদ্ধটা শু থেকেই ছিল ইংরেজদের। আমরা তাদের সাপ্লায়ার। আমাদের কাজ ছিল ঘরের যাবতীয় গ ছাগল কেটে সৈন্যদের সাপ্লাই করা। ধান চাল-গম গরীবকে খেতে না দিয়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে গোলায় আটকে রেখেছিল যাতে সৈন্যদের খাদ্যভাণ্ডারে টান না পড়ে। এভাবে পঞ্চাশের মন বন্তরে ৪০ লক্ষ লোক মারা পড়েছে।

যারা যুদ্ধের সময় চিনি, চাল, কাপড়, কেরোসিন নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট করত, তারাই রাতারাতি ভোল পাল্টে কংগ্রেসে ভিড়ে গেল, দেশ স্বাধীন হবার সময়। যে নৈতিক অধঃপতন আগেই শু হয়েছিল, কংগ্রেসে ভিড়ে সেই অধঃপতনকে তারা কলাবিদ্যায় রূপান্তরিত করল।

এ সময়কার কন্ট্রাক্টর, সাপ্লায়ার, পারমিটধারীদের রঙ বদল দেখার জিনিস। দিল্লী থেকে শঙ্করস্ উইকলি ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হল আর প্রায় শু থেকেই এই কন্ট্রাক্টরদের রঙ-বদল নিয়ে তিনি কার্টুন ছাপতে শু করেছেন। সাহিত্যে বা ইতিহ াসের পাতায় এই রঙ-বদলের কোন ছাপ পড়েনি কিন্তু কার্টুন তো ইতিহাসকে ধরে রাখে, কার্টুনেই থাকে সমসাময়িকক ালের দৈনন্দিন বদলের ছাপ। ঐ সময়কার কার্টুন দেখলেই পরিবর্তনের হাওয়াটা চোখে পড়বে।

যখন আনন্দবাজারে এলাম, তখন চারিধারে কেবল নেই নেই ডাক। দোকানে চাল নেই, রেশন দোকানে যা আছে তার কঁ াকরের ভাগ এত বেশি যে রান্নার আগে ডেন্টিস্টকে দেখিয়ে ছাড়পত্র নিতে হয়। আটা মানে অর্ধেক সোপ-স্টোন পাউড ার। সিমেন্ট মানে গঙ্গা মৃত্তিকার ভেজাল। স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ নামক যে বস্তু রেশনে দেওয়া হত সেই বস্ত্রখণ্ড জলে দিলে মশারি হয়ে যেত।

এই 'নেই-নেই' পরিবেশে আমায় কাজ শু করতে হল। ১৯৬১ সালে প্রথমে শু করি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত হয় সর্বপ্রথম। রাত্রে লোকসেবকের সাব-এডিটর। দিনে টো টো করে ঘুরে বেড়াই। উদ্দেশ্যহীনভাবে স্কেচ করে যাই। সবই উদ্দেশ্যহীন নয়। সবচেয়ে নিখরচায় বইপড়া যেত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। আর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও বিনাপয়সায় রিডিংমে বই পড়ার ব্যবস্থা ছিল। যা উপার্জন / লোকসেবকের মাত্র আঠারো টাকার বেতন। তাও প্রায় দু-এক মাস বকেয় া থেকে যেত- তাতে খাওয়া কুলোত না কিন্তু ন্যাশনাল লাইব্রেরি যাওয়া চলত। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে প্রথম গিয়েছিল াম লোকসেবক সম্পাদকের চিঠি নিয়ে। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে পুরাতন সংবাদপত্র দেখতে সেই শু, আজও সুযোগ পেলেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি আমার বনলতা সেন। সেখানে অচিরে সন্ধান পেলাম নতুন এক আকর্ষনের বিষয় - যার গালভরা নাম কালচারাল এ্যানথ্রোপলজি। সৃষ্টির আদি পর্বের মানুষের আবির্ভাব থেকে ত ার ত্রমোন্নতির ধাপগুলি নিয়ে এর আলোচনা আজও বিষয়টি আমায় টানে। এর সঙ্গে পাশাপাশি আঠার ও উনিশ শতকের ইংরেজ, ডাচ, জার্মান, পর্তুগীজদের লেখা ভ্রমণ কাহিনী পড়তে শু করি। পরবর্তীকালে বিদেশিদের চোখে বাংলা নামে একটি বই লিখেছি সেই লোকসেবকের যুগেই। সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রকাশ করেছিলেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দুটি-বই-এর কোনটি আমার কার্টুন আঁকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। রঙ্গব্যঙ্গের বই নয় সেসব। কিন্তু কোন বিদ্যাই বিফলে যায় না। কার্টুন এমন একটি বিষয় যাকে বলা যায় সর্বগ্রাসী। উনিশ শতকের বাঙালীর পোষাক কী রকম ছিল সেটা ইংরেজ ভ্রমণ কারীরা লিখে গেছেন। সেই জ্ঞ

ান মনে রেখে একালের বাঙালির পোষাক নিয়ে কিছু লেখা বা আঁকা তো চলতেই পারে। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। সরাসরি কার্টুন আঁকতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কোন কাজে লাগে না। অথচ, আমার সর্বাধিক সংখ্যক কার্টুনের মূলে তাঁরই কবিতা। রবীন্দ্রনাথ থেকে লাইন ধার করে সর্বাধিক সংখ্যক ক্যাপসন আমি ব্যবহার করেছি। পুলিনবিহারী সেনের নির্দেশ ছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্যাপসন ব্যবহার করলে যেন তাঁকে মূল কার্টুনটা উপহার দিই। পুলিন সেন আমার উৎসাহদাতা এবং বহু কার্টুনের সংগ্রাহক। এসময় আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত সমকালীন একটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা। শুতে সৌম্যেন ঠাকুর যুত্ত সম্পাদক ছিলেন। আমার সকল গ্রাম্যতা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও আনন্দদার স্নেহ ভালবাসা প্রচুর পেয়েছি। বঙ্গ সংস্কৃতি এবংরবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের মূল্যবান টিকিট বিনা পয়সায় পেয়েছি। সমক ালীনে নিয়মিত লেখার জন্য আনন্দদার তাগিদ আমায় মোটামুটি ছোটমাপের প্রাবন্ধিক করে তুলেছিল। সন্তোষদা যেদিন আমায় আনন্দবাজারে চাকরির জন্য ডেকে পাঠালেন, সেদিন প্রথমেই তিনি বললেন - সমকালীনে আপনার সব প্রবন্ধই পড়েছি।

ভালো কার্টুনিস্টে র নিজস্ব একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বোধ থাকা দরকার। নিজের রাজনৈতিক ধ্যান ধারনা নিজের কাছে স্পষ্ট না থাকলে সাধারণ পাঠককে সেটা বোঝানো শত্ত হয়। সংবাদ পত্র অফিসে যারা সম্পাদকীয় লেখেন তাঁদেরও একই সমস্যা। একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা সাংবাদিকের নিজের না থাকলে তিনি সাধারণ পাঠককে নিজের কথা কোন বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে বলবেন? গোপাল হালদার বা সমর সেন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ছেড়েছিলেন, কারণ একটি স্পষ্ট র াজনৈতিক বিশ্বাস তাঁদের ছিল। সরোজ আচার্যকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তিনিও বামমার্গী- পড়াশুনার ব্যাপকতা, এখনক ার গড়পড়তা সাংবাদিকের ধারনার অতীত। তিনি মতভেদ ঘটবে বুঝতে পারলে সে বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেন ন া। কারণ নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের বাইরে কিছু লেখা তো নিজের বিবেকের বিরোধিতা করা। কার্টুনিস্টের ক্ষেত্রে ব্যাপ ারটি আরও গুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁকে সমকালীনঘটনাবলী ব্যাখ্যা করতে হয়। যাঁরা বিশুদ্ধ সামাজিক কার্টুন প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে আঁকতেন, সচিত্র ভারত বঙ্গশ্রী ইত্যাদিতে, তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন না থাকলেও চলত। প্রমথ সমাদ্দার বা রবীন ভট্টাচার্য বগলে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসাতেন।

কালটা যুদ্ধের সময়। দেশটা পরাধীন। শাসক বিদেশী সরকার চাইতেন, দেশবাসী অভাব অনটনের মধ্যে আফিমখোরের মত ঝিমোবে। মাঝে মাঝে মজার মজার কার্টুন দেখে হেসে লুটোবে। ভাত কাপড়ের জন্য বায়না ধরবে না, ইনকিলাব জিন্দ াবাদ বলবে না। ইস্পাহানিরা কেন চাল মজুত করে সাধারণ মানুষকে খেতে না দিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলল, সে নিয়ে প্রশ্ন করবে না। তারা কেবল হাসবে আর হাসবে। ভাববে না চিন্তা করবে না। সত্য ঘটনা জানার আগ্রহ দেখাবে না। এক কথায় দেশের তণ সমাজের চিন্তাশত্তিকে ভোঁতা করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ঐসব পত্রিকার। শ্রদ্ধেয় কুমারেশ ঘোষ যষ্টিমধুর কোন এক সংখ্যায় লিখেছেন, আমি আনন্দবাজারে যোগ দিতে পেরেছিলাম পরশুরামের /রাজশেখর বসু- সা র্টিফিকেট দেখিয়ে। কথাটি ঠিক নয়। 'যষ্টিমধু'র কোন এক পূজা সংখ্যায় রাজশেখরবাবুর একটি গল্পের অলংকরণ করেছিলাম। রাজশেখরবাবু কুমারেশবাবুর কাছে আমার প্রশংসা করেন। কুমারেশদার পরামর্শে ও বালকোচিত চাপল্যে আমি রাজশেখর বাবুর কাছে চিঠি দিই। তিনি পরদিনই আমার ছবির প্রশংসা করে আমায় চিঠি দেন। কুমারেশদা সেই চিঠি যষ্টিমধুতে ছাপেন। প্রমথ রবীনের জোড়া ঘোড়া সম্বল করে 'সচিত্র ভারত' বহুদুর এগিয়েছিল। মাঝে মাঝে পিসিয়েল এখানে কার্টুন দিতেন। সচিত্র ভারতের মালিক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (স্যার রাজেনের বৈমাত্রেয় ভাই) স্বয়ং পিসিয়েলকে কার্টুন দিতে অনুরোধকরেছিলেন। পিসিয়েল সচিত্র ভারতে লীগ মন্ত্রি সভার কার্যকলাপকে চ্যালেঞ্জ করলেন। এতদিন পর্যন্ত হাসিঠাট্টা মস্করা করে বেশ চলছিল ছেলেমেয়েদের প্রেম, মাতালের মাতলামি, প্যান্ট-সার্ট হাতে বেটন নিয়ে মেয়ে এ-আর-পি বা ওয়াকাই (উইমেন্স অক্সিলিয়ারি কোরে, বহু মেয়ের চাকরি হয়েছিল) ইত্যাদিদের নিয়ে ঠাট্টা করা ছিল প্রমথ-রবীনদের কাজ।

একালের কোন উৎসাহী পাঠক যদি যুদ্ধকালীন কার্টুন ও সেই সময়কার মুখে মুখে প্রচলিত হিউমারগুলি সংকলন করেন তাহলে হারিয়ে যাওয়া অনেক মনিমুক্তা রক্ষা পাবে। যুদ্ধকালীন নগর জীবনকে কাছে থেকে দেখেছেন, প্রবল অভাব অনটন, ব্ল্যাক আউট, ইভ্যাকুই ইত্যাদির শিকার হয়েও, এমন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এখনও (যাদের গড় বয়স আশি) প্রচুর জীবিত অ াছেন। কলকাতায় প্রচুর টিভির চ্যানেল। কেউ কি উদ্যোগী হয়ে এই সব মণিমুক্তো হারিয়ে যাবার আগে উদ্ধারের দায়িত্ব

নিতে পারেন না?

দেশ বিভাগের জন্য উদ্বাস্তু অর্থে রিফিউজি শব্দটির সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট পরিচয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় কলকাতায় বোমা পড়তে পারে এই আশংকায় বহু পরিবার মহানগরীর তিনপুষের বাড়ি ঘর ফেলে মফঃস্বলের দিকে রওনা হয়েছিলেন, অন্নহীন বস্ত্রহীন অবস্থায়। এদের বলা হত ইভ্যাকুই। প্রত্যেক রাস্তায় ইলেকট্রিক বাল্বের চারিপাশে কালো কাগজের ঠুলি পরিয়ে দেওয়া হয়ে ছিল যাতে জাপানী বিমান রাতের বেলা আলো দেখে কলকাতা শহরকে চিনতে না পারে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে-বৌরা উচচ বেতনের লোভে, খাঁকি প্যান্ট-শার্ট পরে হাতে বেটন নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন যুদ্ধের কাজে ইংরেজদের সাহায্য করতে। এই যে ঘোমটা ছেড়ে প্যান্ট পরে মেয়েদেরপথে নামা এটা তো বঙ্গ-ললনার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তারাশঙ্কর তাঁর মন্বন্তর উপন্যাসে বঙ্গ-রমণীর এই শৃঙ্খল ভঙ্গের উদ্যোগ ও তার পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয় া নিয়ে আলোচনা করেছেন। যুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে আমদানী করা প্রচুর আমি কার্টুন বই ফুটপাথে ঢেলে বিক্রি হত। এসব কার্টুনে প্রচুর সেক্স-এর ভেজাল ছিল। কিছু দিন আগেও ম্যান-ওনলিপত্রিকা কলকাতায় আসত। মনে হয় পত্রিকাটি উঠে গেছে। প্রমথ রবীনদের প্রমোদসর্বস্ব কার্টুনের বিপরীত মেতে এল আমার কার্টুন। এনটারটেনমেন্ট নয়, কমিটমেন্ট। ঘুম পাড়ানি কার্টুন নয় ঘুম ভাঙ্গাবার কার্টুন। বিশুদ্ধ প্রমোদ বলে কিছু নেই। সব কিছুর সঙ্গেই রাজনীতি বা সরকার কম বেশি জড়িত। চালের দাম এক টাকা বাড়লে খাদ্যনীতি চলে আসে, খাদ্যনীতি মানেই সরকার সরকার মানেই রাজনীতি। কলে জল আসতে দেরী করলে অফিসে যাওয়া হয় না স্নানাভাবে। পুরসভার সমালোচনা করতে হয় চলে আসে রাজনীতি। ছেলেমেয়েরা বিয়ে করতে পারে না কারণ বিয়েরপর বসবাসের জন্য ঘর পাওয়া যায় না। গৃহ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের দায় আছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান তার নাগরিকদের অন্নবস্ত্র শিক্ষা বাসস্থানের গ্যারান্টি দিয়েছে। এর যে কোনটা না মানলে সরকার কার্টুনিস্টের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে। কার্টুনিস্ট হিসাবে আমার কাজ হল দেশের সাধারণ ন াগরিকদের সংবিধানে যে সব অধিকার দিয়েছে সেগুলি লঙিঘত হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখা।

পিসিয়েল প্রধানত রাজনৈতিক কার্টুন করতেন বলে স্বাধীন ভারতের সামাজিক জীবনের এই বিপুল পটপরিবর্তন তেমন ভ াবে ধরা পড়েনি। আমার আনন্দবাজারের তির্যকে বা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডর্ডের থার্ড আই ভিউতে দিন বদলের কথা তুলে ধরা হত। আমার সাফল্যের অন্যতম কারণ আমি পরিবর্তিত অবস্থায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছিলাম। পরিবর্তনকে চিহিত করেছি। স্বাধীন ভারতের নাগরিকরা স্বাধীনতার ঠিক পরে কত দুঃখের মধ্যে দিন কা টিয়েছে আমার যে কোন দশটি কার্টুনের পাঁচটি দেখলে সেটা নতুন প্রজন্মের পাঠক ধরতে পারবেন। আমি কাজ শু করল াম এই নেই-নেই পশ্চাদপটে। সাধারণ মানুষ দিনযাপনের গ্লানিতে এতই কষ্ট পেতেন যে কাড় দরজায় সমাধানের জন্য য াবেন ভেবে পেতেন না। সকালে কল খুলে দেখলেন জল নেই। কোথাও দেখা গেল কলের জলের সঙ্গে ছোট সাপ বের হয়ে এসেছে। এক কাপ চা মুখে দিয়েছেন, গা ঘিন ঘিন করে উঠল। চায়ে চামড়ার গুড়োর ভেজাল। খাদ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেই তিনি সংখ্যাত ত্ত্ব আউড়ে প্রমাণ করে দেবেন, সব ঠিক হ্যায়। আর আনন্দবাজার ও যুগান্তর দুটি বাংলাপত্রিক াতেই তখন খাদ্যমন্ত্রীর প্রসাদ পষ্ট বেশ কিছু রিপোর্টার ছিলেন যাঁরা অনেক ঘটনা কৌশলে চেপে যেতেন। একথা জোর দিয়ে বলছি এজন্য যে আমি ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত সরকার-বিরোধী কাগজ দৈনিক লোকসেবকে কাজ করছি। বিরে াধী-পক্ষের কাগজে থাকার সুবাদে, সংবাদ চেপে যাবার বহু ঘটনা জানার সুযোগ হত। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত প্রথম যে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলেছিল, নেহে তার উদ্বোধন করেছিলেন। আমি লোকসেবকের পক্ষ থেকে সেই ট্রেনে ছিলাম। ট্রেনে কাটা পড়ে বেশ কয়েকজন মারা যায়, বেশ কয়েকজনের পা কেটে বাদ দিতে হয়। শ্রীরামপুরের ওয়েলশ হাসপাতালে অ াহতদের রাখা হয়। রেলের পি-আর- ওদের চাপে বড় দুটি কাগজ সে খবর চেপে যায়। লোকসেবকে আমরা ছেপেছিল াম। অনাহারে মৃত্যু-সংবাদও আনন্দবাজারের চিফ্ রিপোর্টার প্রফুল্লদাকে খুশি রাখার জন্য চেপে যেতেন।

সন্তোষকুমার ঘোষ এসে আনন্দবাজারের যখন হাল ধরলেন তখন প্রফুল্ল সেন অতুল্য-ঘোষদের ঢাক পেটানো রিপোর্ট াররা ভয় পেলেন। সন্তোষবাবুর সঙ্গে যত দুর অসহযোগিতা করা যায় তা করতে শু করলেন। বেশ মনে আছে, গৌরকিশোর ঘোষকে রিপোর্টার থেকে সাব-এডিটরদের টেবিলে যখন বসানো হল, চিফ সাব গৌরদাকে কোন কাজই দিতেন না। কাগজের সার্কুলেশন বাড়ছে। নতুন নতুন ফিচার পাঠকদের দৃষ্টি আর্কষণ করছে। আমার কার্টু ন ঠেকাবার জন্য ঐ চিফ রিপোর্টার কম চেষ্টা করেন নি। সবই ব্যর্থ হয়েছে।

প্রফুল্ল সেন সকালের আনন্দবাজারে আমার কার্টুন দেখেই খেপে যেতেন। আনন্দবাজার- যুগান্তরের দুই চিফ রিপোর্টারের কাজ ছিল অফিসে যাওয়ার আগে প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া। আমার অন্তত দু দিনের ঘটনা মনে পড়ছে যখন চিফ রিপোর্টার আমায় লিফ্‌টে ওঠার সময় আমায় জানিয়ে দিলেন, প্রফুল্ল সেন চটেছেন। ব্যাপারটা অশোক সরকারের (মালিক ও সম্পাদক) কানে উঠলে হয়তো বকুনি খাব বা চাকরিটা নষ্ট হয়ে যাবে। সন্তোষদাকে আমার ভয়ের কথাটা বললাম। সন্তোষদার এক জবাব আমি তো এটাই চাইছি। মন্ত্রীরা যদি কার্টুন দেখে চটে তাহলে তো কার্টুনটা ভালো হয়েছে বুঝতে হবে। ভয় নেই, মন্ত্রী চটেছেন শুনলে অশোক খুশি হবেন।

আমি দুটি ব্যাপারে খুব ভাগ্যবান। অশোক সরকারকে সমগ্র কর্মজীবনে তিন চারবারের বেশি দেখিনি। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি এবং উৎসাহদান প্রতিদিন টের পেতাম। পার্লামেন্টে দুবার এবং বিধান সভায় আমার কার্টুন নিয়ে হৈ চৈ হয় বেশ কয়েকবার। প্রত্যেকবার ভয় পেয়েছি। অশোকবাবুর পি. এ. সুবলবাবু নিজে থেকেই এসে অভয় দিয়ে গেলেন তুমি যেমন করছ, তেমনটি করে যাও। অশোকবাবু বলেছেন, আইন-আদালত হলে তিনি সামলাবেন।

একবার চালের বাজারে প্রবল সংকট। কোন কালোবাজারিকেই প্রফুল্ল সেন গ্রেপ্তার করছেন না। কেবল মুখে হুঙ্কার ছাড়ছেন। ঠিক এই সময়ে একটি খবর ছাপা হল কলকাতার কাগজে। জাপানী বিজ্ঞানীরা এক ধরণের কাঠের বেড়াল বানিয়েছেন যার ধারে ইঁদুর এসে লাফালাফি করলে সেই কাঠের বেড়াল ম্যাও ম্যাও করে ডাক ছাড়বে। আর ইঁদুর ভয় পেয়ে পালাবে। পরদিনই কার্টুন আঁকলাম। কলকাতায় কাঠের বেড়াল। প্রফুল্ল সেন ম্যাও ম্যাও করছেন কিন্তু ইঁদুররা তাতে ভয় পাচ্ছে না।

আগেই বলেছি, প্রফুল্ল সেনের মুখে গান্ধীবাদ, মনে স্বুর প্যাঁচ। তিনি গোপনে নির্দেশ দিয়ে আনবাজারের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিলেন। দিনের পর দিন যুগান্তর বসুমতীতে সরকারী বিজ্ঞাপন রিলিজ হচ্ছে। কিন্তু সে সব বিজ্ঞাপন আনন্দবাজারে নেই। খোঁজ নেওয়া হল। বিজ্ঞাপন বন্ধের কোন সরকারী নোটিশ নেই। জানা গেল সবই। গান্ধীবাদী প্রফুল্ল সেনের পবিত্র ক্রোধ আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপন বন্ধ করেছে। অতুল্য ঘোষকে অশোকবাবু জানালেন। খোঁজ নিয়ে অতুল্যবাবু জানালেন আনন্দবাজারে সরকারীভাবে কোন বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয়নি। বিজ্ঞাপন বন্ধের রহস্য উদঘাটনে আনন্দবাজারের চিফ রিপোর্টারের কোন উৎসাহ ছিল না। এর মধ্যেই সবাই জেনে গেছে, প্রফুল্ল সেনের বিদ্ধে কার্টুন করায় আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছে। অশোক সরকার সব শুনছেন, কিন্তু আমায় সাহস দেবারজন্য আমায় কিছু জানাননি। আমায় ব্যাপারটি জানালেন, বিজ্ঞাপন সচিব, বিভুতি গুপ্তভায়া। এর কিছুদিন আগেই বণের উৎসাহে আমার লোকসেবকের সহকর্মী ও বন্ধু দুঃসময়ের বন্ধু কিশলয় ঠাকুর আনন্দবাজারে যোগ দিয়েছেন। হঠাৎ একদিন, একটি গাড়ি নিয়ে কিশলয়, আমি ও ফটোগ্রাফার বীরেন সিংহ সন্ধ্যার পর রওনা দিলাম। কিশলয় আমায় নিয়ে গ্রেস্ট্রীট আর চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর সংযোগস্থলে এক বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে পৌঁছল। রাত নটা এই বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান থেকে 'গল্পভারতী' নামক মাসিক পত্রিকা বের হত। পিছনের দরজা দিয়ে আমি আর কিশলয় প্রবেশ করলাম। বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান থেকে একটি ফাইল বগলদাবা করে গাড়িতে চলে এলাম অফিসে বীরেনদা তৎক্ষণাৎ ফাইলের দুটি চিঠির ছবি তুললেন। আমি আর কিশলয় গাড়ি নিয়ে ফিরে গেলাম সেই অফিসে। ফাইল যথাস্থানে রাখা হল। যে চিঠির ছবি ছাপা হল তাতে লেখা — পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আনন্দবাজারে নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনগুলি বন্ধ রাখবেন স্বাক্ষর। এ. কে. চ্যাটার্জী, পি. এস. মাথুরের পক্ষে।

সবার উপরে লেখা কনফিডেনসিয়াল। প্রমাণ হয়ে গেল প্রফুল্ল সেনের নির্দেশেই আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছিল। ক্ষতির পরিমাণ নয় লক্ষ টাকা। এই ফটোকপি পরদিনই অতুল্য ঘোষের কাছে পাঠানো হয় এবং সে রাত্রেই আবার বিজ্ঞাপন আসতে শু করে। অশোকবাবুর সহিষ্ণুতা এতই অধিক যে আমি মানসিকভাবে আঘাত পাব বলে তিনি নয় লক্ষ টাকা লোকসান করেছেন অথচ আমায় জানাননি। ভালো কার্টুনিস্ট তৈরি করার মূলে কাগজের মালিক- সম্পাদকদেরও যে অনেক আত্মত্যাগ থাকে সেটা একালের পাঠকদের জানানোই এই ঘটনাবলী লেখার উদ্দেশ্য। 'নেই নেই' যুগটা ছিল যে কোন কার্টুনিস্টের কাছে লোভনীয় কাল। কার্টুন হল (বলা ভালো হওয়া উচিত) সমাজের দর্পণ। কার্টুনের মধ্য দিয়ে যদি সাধারণ পাঠক দেখে তার নিত্যদিনের অভাব অনটন দুঃখ বঞ্চনার কথা প্রতিফলিত হচ্ছে তাহলে কার্টুনিস্ট খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। রেশনে কাঁকর মেশানো পচা চাল দেওয়া হচ্ছে। অথচ কার্টুনে যদি দেখানো হয়রেশনে ভালো চাল সংগ্রহের জন্য লম্বা লাইন পড়েছে তাহলে সরকার হয়তো খুশি হবেন কিন্তু পাঠকরা কার্টুনিস্টকে খাদ্যমন্ত্রীর দাল

ালবলবে।
চীন যুদ্ধের বেশ কিছু দিন পরের ঘটনা। আমার কার্টুনে প্রফুল্ল সেনের প্রতি কটাক্ষ থাকত। বিধানসভায় জেনে শুনে প্রচুর মিথ্যা স্ট্যাটিসটিক্স' (সংখ্যাতত্ত্ব) আউড়াতেন যার মানে কেউ বুঝতনা। কিছু রিপোর্টার ছিল যারা বিধানসভায় ভিতরে ব াইরে খাদ্যমন্ত্রীকেঅকারণে তোষামোদ করে যেত। আনন্দবাজারের পাতাতেই কার্টুনে বলা হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্ব মিথ্যা, ক্ষুধা সত্য, ক্ষুধায় অন্ন না পাওয়াটাও সত্য। সংখ্যাতত্ত্ব শুনে পেট ভরে না। আমার কার্টুনে প্রফুল্ল সেন প্রায়ই আক্রান্ত হতেন। আর বিধানসভায় ডাঃ বিধান রায় নিজের খাদ্য মন্ত্রী জেনেও তাকে বাচাঁবার চেষ্টা করতেন না। ব্যক্তি জীবনে তিনি খুব তে াষামোদ পছন্দ করতেন। চিফ রিপোর্টার তো বীজমন্ত্র হিসেবে প্রফুল্লদার নাম জপতেন। সেন মহাশয় মুখে খুব তড়পাতেন, সকাল হলেই কালোবাজারিদের ধরবেন আর ইঁদুর ছানার মতন ফাঁসি দেবেন। তাঁর সমগ্র মন্ত্রী জীবনে কোনো কালোব াজারিকে ধরেছেন বলে শুনিনি। আমি একবার কার্টুন করেছিলাম (আনন্দবাজারে নয়) একদল কালোবাজারি হাতে দড়ি নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসছে — দুর থেকে তাই দেখে শাড়ি পড়ে প্রফুল্ল সেন গাছের মগডালে উঠেছেন ক্যাপসন ছিল — ঐ ডিডি ঢল্লে। (গিরিশ চন্দ্রের প্রফুল্ল নাটকের গডাঢর চন্দ্রের উক্তি) আরেকটি কার্টুন — রেশন দোকানের পাশে ডেন্টিস্ট চেম্বার খুলেছেন। কাঁকর পরীক্ষা করে দাঁতে সইবে কিনা বলে দিচ্ছেন।
আর একটি— একটি ঘোড়াকে জোর করে রেশন দোকানের কাছে আনা হয়েছে। ঘোড়াটার ভয়, তাকেই হয়ত রেশন-এর পচা চাল খেতে হবে।
সে সময় খাদ্য সংকট এতই চরমে যে বহুলোক খেতে না পেয়ে মারা যায়। কখনও কখনও এরকম অনাহারের মৃত্যু সংবাদ কাগজেও বের হত। কাগজে এরকম সংবাদ অর্থাৎ অনাহারে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ হলে প্রফুল্ল সেনকে আত্মপক্ষ সমর্থনে নির্লজ্জ হয়ে একটি বিবৃতি দিতেই হয়। বিধান সভায় তখন প্রজা সোসালিস্টদের প্রবল দাপট। কম্যুনিস্টদের ধারে কাছে প াওয়া যেত না। নদীয়ার হরিপদ চাটুজ্জে অনাহারে মৃত্যু সংবাদের উল্লেখ করলেন বিধানসভায়। প্রফুল্ল সেন কেবল যে নির্লজ্জ ছিলেন তাই নয় অনৃত ভাষণেও পটু। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সাফাই দিলেন অনাহারে নয়, হার্টফেল করে ঐ গরীব মানুষটি মারা গেছে।
একাধিকবার প্রতিটি অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাকে হার্টফেলজনিত মৃত্যু বলে কারণ দেখানোয় ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ক্ষেপে গেলেন তাঁর নিজের মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না। ডাঃ রায় সভায় দাঁড়িয়ে বললেন— সব মানুষই হার্ট ফেল করে মারা যায়। হার্ট ফেল করলে তবেই তাকে মৃত্যু বলে। খেয়ে মরলেও হার্ট ফেল করে মারা যায়, না খেয়ে মরলেও হার্ট ফেল করে মারা যায়। এ ঘটনাটা যখনকার, তখন আমি লোকসেবকে । প্রায়ই বিধানসভায় যেতাম রিপো র্টিং-এর জন্য। আমি আনন্দবাজারে আসার পর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। নিকুঞ্জ মাইতি ছিলেন সরবরাহ মন্ত্রী। ইনি আভ া মাইতির বাবা। বাজারে পরবার মতো কাপড় নেই। রেশনে যে কাপড় দেওয়া হল তাতে লজ্জা নিবারণ করা যেত না। নিকুঞ্জবাবু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পরামর্শ দিলেন— হাফপ্যান্ট পরা অভ্যাস কর অনেক সমস্যার সমাধান হবে। পরদিন আনন্দবাজারে কার্টুন আঁকলাম। বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, নিকুঞ্জ মাইতি, ভুপতি মজুমদার ইত্যাদি সবাই হাফ প্যান্ট পরে রাইটার্সে হাজির হয়েছেন। কার্টুনটা হৈ চৈ ফেলেছিল। সাধারণভাবে সংবাদটির কোন গুত্ব ছিল না। মন্ত্রীরা উল্টোপাল্টা অনেক প্রলাপ বকেন। কিন্তু সেই সাদামাটা সংবাদটি যখন কার্টুনে রূপ পেল তখন পাঠক লুফে নিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে আমার এই হাফপ্যান্ট মন্ত্রীসভার কার্টুন, সরকার বিরোধীরা দেওয়াল-চিত্র আকারে ব্যবহার করেছিল। ভোটের প্রচারে সেটাই প্রথম দেওয়াল চিত্র।
দুটি ব্যাপার আমার সাফল্যের মূলে কাজ করেছিল। একটি অশোক সরকারের মতো বটবৃক্ষ যিনি শত দুর্বিপাকের মধ্যেও আমায় সাহস যুগিয়েছেন, মনোবল অক্ষুন্ন রেখেছেন। দ্বিতীয়টি হল সে সময়ের আনন্দবাজারের পরিবেশ। সন্তোষ ঘে াষ, সুবোধ ঘোষ, সরোজ আচার্য এবং সর্বকনিষ্ঠ নীরেন চক্রবর্তী— যাঁদের আলাপ- আলোচনা সাহিত্য-সংস্কৃতির এক বিশাল অঙ্গনে পরিব্যাপ্ত ছিল। যে কোন আকাট মুখ্যুও ঐ পরিবেশে পণ্ডিত হয়ে যেতে পারে। একদিন সরোজ আচার্য ডেকে পাঠালেন। গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। বললেন— তোমাদের বাড়ি?
শুনলেন।
বললেন— আমার বাড়িও কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে তিনি পড়েছেন, জানতাম। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলসের

চত্রবর্তী পরিবারের অনেককে চিনি এবং এখনও যোগাযোগ আছে সেটা বললাম। তিনি আমায় কয়েকটি বই দিলেন। আনন্দবাজার লাইব্রেরিতে কোন্ কোন্ বই আছে এবং পড়ে নিতে হবে, সেটাও বলে দিলেন। শু হল এক নতুন অধ্যায়। আনন্দবাজারে চাকরি করতেহলে নিজেকে তার উপযোগী করে তৈরি করে নিতে হবে। এই উদার পারস্পরিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ঐ সব বনস্পতিদের মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায়। ঐ পরিবেশ আমায় তৈরি করেছিল। অতগুলি সৃজনশীল মানুষ আমার মনকে করেছিল নির্ভীক, চিন্তাকে করেছিল তার্কিক অথচ হৃদয়কে ভরে দিয়েছিল সীমাহীন উদারতায়।

রসকসহীন প্রফুল্ল সেন সম্পর্কে যেমন বললাম, তেমনই তাঁরই মন্ত্রিসভার এক রসিক মানুষের কথা বলি যিনি অগ্নিযুগে বিপ্লবী ছিলেন।

বিধান রায় মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রী বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার চুঁচড়োর মানুষ। বহুবার কারাবরণ করেছেন। মনে মনে স্বদেশী যুগটাকে তিনি বহন করতেন। আদ্যোপান্ত সৎ মানুষ হিসাবে তিনি বন্দিত। পার্ক স্ট্রিটে নৃপেন মজুমদার তখন ছবির গ্যালারি খুলে কলকাতায় বেশ একটু চাঞ্চল্য এনেছিলেন। সেটাই কলকাতায় প্রথম গ্যালারি যেখানে ছবি বেচা-কেনা হত। এখন তো কলকাতায় পাড়ায়-পাড়ায় আর্টগ্যালারি। নৃপেন মজুমদার এ ব্যাপারে পথিকৃৎ।

নৃপেনের এই নতুন আর্ট গ্যালারিতে একবার একটি চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধনের জন্য মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার এসেছিলেন। আমি অন্যতম আমন্ত্রিত দর্শক। অনুষ্ঠান শুর আগে নৃপেনবাবু উপস্থিত আমন্ত্রিতদের সঙ্গে মন্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় করব।

সত্যিই তাই। অনুষ্ঠানের পর চা পর্ব শেষ হতেই ভূপতিবাবু আমার কাছে এসে বললেন— কার্টুনিস্টদের সম্পর্কে আমারকৌতুহল প্রচুর। দু-জনে হাঁটতে হাঁটতে যাব। এখনকার মন্ত্রীরা নিজেদের আড়ম্বর বাড়াবার জন্য দু-পাশে হুটার নেন, সামনে পিছনে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে অপ্রয়োজনে নিয়ে নিজেদের মূল্যবান প্রমাণের চেষ্টা করেন। সেটা কংগ্রেসের কাল, ভি. আই. পি. কেবল বিধান রায়। শুধু তাঁর গাড়ির সামনের গাড়িতেই লাল আলো জ্বলে। নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চয়ই ছিল, তবে চোখে পড়ত না। ভূপতি মজুমদার ক্যাবিনেট মন্ত্রীহওয়া সত্ত্বেও পার্ক স্ট্রীটে উদ্বোধন পর্ব সেরে সদর রাস্তায় নেমে এলেন এবং সর্বাগ্রে তাঁর গাড়ি ছেড়ে দিলেন। বললেন— পায়ে হেঁটে ময়দানের মধ্য দিয়ে আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাব। আমি অবাক। এক বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁর চেয়ে অনেক ছোট, (প্রায় নাতির বয়সী বলা ভালো) এক তণ কার্টুনিস্টের সঙ্গে গল্প করতে করতে ময়দানের মধ্য দিয়ে চলেছেন— এ দৃশ্য এখনকার কোন সাংবাদিক ভাবতে পারেন।

ভূপতিবাবু প্রচুর কৌতুহল নিয়ে প্র্ন করে চলেছেন,— আইডিয়া কীভাবে ধরি, ক্যাপসন নিজে করি না অন্য কেউ করে দেয়, ছবি আঁকার বিদ্যা কার্টুনিস্টদের কাছে কতটা গুত্বপূণ— ইত্যাদি। আমি দুচারটে কথা বলার পরই বুঝলাম, চিত্রবিদ্যা সম্পর্কিত প্রচুর জ্ঞানে ধনী এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছি। অচিরে নিজের বিদ্যার সীমাবদ্ধতা টের পেলাম। প্লাস্টিকের মগ নিয়ে সমুদ্রের জল মাপার বৃথা চেষ্টা। ভূপতিদাকে ই কথা বলতে দিলাম। আমি শ্রোতা। যৌবনে বিপ্লবী ছিলেন। বহুবার কারাবরণ ও তজ্জনিত অত্যাচারের ফলে শরীর অশক্ত। ছেঁড়া খদ্দরের জামা) গাড়ি থাকতেও তিনি একজন শিল্পীর সঙ্গে গল্প করবার জন্য ময়দানের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছেন। এ রকম অনাড়ম্বর, সুখে নিস্পৃহ, প্রচুর সরকারী কাজ সত্ত্বেও ছবি ও শিল্পী সম্পর্কে তীব্র কৌতুহল, এদেশের মাটিতে খুব বেশী জন্মায়নি। শিল্প প্রেম খাঁটি হলে তাঁকে নেমে আসতে হয় মাটিতে শিল্পীর কাছাকাছি সমতলে। ঘাসের ডগায় শিশিরের নাম মানায়— ঘাসে শিশিরে বন্ধুত্ব হয়।

ভূপতি মজুমদার আর ইন্দিরা গান্ধী এই দুজন ছাড়া আর কারও নাম মনে পড়ছে না। ইন্দিরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছেই ছুটতেন নন্দবাবুকে প্রণাম করতে এবং মুকুল দের সঙ্গে দেখা করতে। কোনও প্রোটোকল তিনি মানতেন না। একেবারে হাল আমলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখছি সরকারী কাজের চাপ সত্ত্বেও শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে খোঁজ খবর সুযোগ পেলেই নেন এবং সাধ্যমত সাহায্যের হাত এগিয়ে দেন। সম্ভবত স্বাধীন ভারতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ থেকে রাজনীতির অঙ্গনে এসেছেন এবং চূড়ায় উঠেছেন। সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু প্রবল সমালোচনাতেও মুখের হাসি তাঁর ম্লান হয় না।

কার্টুনের ব্যাপারে সবচেয়ে রসিক মানুষ প্রয়াত বিনয় চৌধুরী। একাধিক সভায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন আর এক বিদগ্ধ মানুষ ডঃ নিশীথরঞ্জন রায়। এই দুজন মানুষ আমার ও পূর্ণেন্দু পত্রীর কাছে অনেক

কিছু প্রত্যাশা ক রতেন। একবার 'এই সময়' পত্রিকার ঘরোয়া আসরে নিশীথবাবু প্রকাশ্যেই অনুযোগ করলেন চন্ডীবাবুর মত লোক কেবল সংবাদ পত্রের সেবা করে জীবনটা শেষ করবে এটা কেন হবে! বিনয়দাও সেই একই সভায় আমায় বললেন — একটা বড় মাপের কিছু কন। কথা দিয়েছিলাম — চেষ্টা করব। বিনয়দা এবং নিশীথরঞ্জনের উৎসাহেই ? SINCE FREEDOM নামক কার্টুনের প্রদর্শনী (পরে অবশ্য বই
আকারে বের হয়) করি।

ব্রিটিশ আমলে স্বদেশী করার কারণে বিনয়দাকে নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিনসে (বালুচিস্থানে) অন্তরীণ করা হয়। খান অ াবদুল গফুর খানের স্থান ও নাম কার্টুনে দেখে সেদিন হঠাৎ আবেশ বিহ্বল হয়ে ওঠেন ও স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকেন।

রাত প্রায় দেড়টার সময় লোকসেবকে ফাইনাল প্রিন্ট অর্ডারে সই দিয়ে শুতে যাব এমন সময় ফোন এল

— আমি সন্তোষ ঘোষ বলছি। আনন্দবাজার থেকে।

আনন্দবাজারে তখন দুজন সন্তোষ ঘোষ কাজ করতেন। একজনের বাঁ-হাত পঙ্গু থাকায় আড়ালে তাঁকে লেফটিস্ট বলা হত। শ্যামবাজারে সাংবাদিকের আড্ডা নগেন্দ্র কেবিনে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার আলাপ হয়েছে। ভাবলাম তিনিই ফোন করেছেন।

বললাম — বলুন সন্তোষদা, গরীবের কাগজ কি হেডলাইন করল জানতে চান?

পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গল। উত্তর এল, আমি নিউজ এডিটর সন্তোষ ঘোষ ফোন করছি। আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছে সা হিত্যিক ও নিউজ এডিটর সন্তোষ ঘোষ বহু দূরের নক্ষত্র, তিনি ফোন করবেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব এটা স্বাভা বিক ছিল না।অনেক সহজ চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনির সঙ্গে কথা বলা। সন্তোষ ঘোষ তখনই লিজেণ্ড।

গলার স্বর পাল্টে বিনয়ের সঙ্গে বললাম — বলুন সন্তোষদা।

— আপনি এখন কী করছেন।

— সবে প্রিন্ট অর্ডার দিলাম। এবার শুতে যাব।

— তারপর মেসে ফিরবেন? আজ মেসে না ফিরে সোজা আমার বাড়ি চলে আসুন। ভবানীপুরে দেনা ব্যাঙ্কের বাড়িটার দোতলায়। আমার সঙ্গে চা খাবেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার ডাকসাইটে বার্তা সম্পাদক সন্তোষ ঘোষ আমায় সকালে চা খেতে ডেকেছেন। কথাটা ফাঁস করলাম না। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে বিগত এক বছর ধরে আমার কার্টুন প্রথম পাতায় থার্ড-আই ভিউ নাম দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তাতে সহ-কর্মীদের অনেকেই ঈর্ষাকাতর হয়েছেন। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা জুটত যদি সন্তোষবাবুর বা ড়িতে চা খাবার ব্যাপারটা ফাঁস করতাম।

মোটে আঠার টাকা বেতনের সাংবাদিক। তখন দু-মাসের বেতন বাকি চলছে। ট্রামের মান্থলি ভরসা করে রওনা দিলাম ভবানীপুরে। সন্তোষদা একটু আগেই ফিরেছেন। যদিও সারাক্ষণের জন্য গাড়ি ছিল, তবু আনন্দবাজারে নিজে দাঁড়িয়ে প্রথম পাতা সাজাতেন, নিজে হেড লাইন করতেন। তারপর প্রথম মুদ্রিত কপিটি নিজের চোখে দেখে তবে বাড়ি ফিরতেন। প্রথম যৌবনে ভরাযুদ্ধের সময় দিনে 'নবশক্তি' 'ভারত' ইত্যাদির সেবা করেছেন রাত্রে ঠিক উল্টো মতের কাগজ 'মর্নিং নিউজ'-এ কলম লিখেছেন। নাইট ডিউটিকে ভয় পেলে সাংবাদিক হওয়া যায় না। এটা নতুন নয়। সন্তোষবাবুর সা হিত্যিক হাতের ছোঁয়ায় সেই পুরাতন বহু ব্যবহারের জীর্ণকিন্তু পাঠকদের এতই দৃষ্টি কাড়ল যে, সন্তোষবাবুর নাম মুখে মুখে মিথে পরিণত হল। তিনি দিল্লী হিন্দুস্থানের স্টাফ, এসেছেন কলকাতায় আনন্দবাজারে। তাঁকে তো অশোক সরকার ব াইরে থেকে এনে চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রতিদিনের কাজে বাধা পাচ্ছেন চিফ রিপোর্টার শিবদাসের কাছ থেকে, অন্যান্য চিফ সাবরাও সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছেন না। বণ সেনগুপ্ত তখনও সরকারীভাবে আনন্দবাজারেযোগদেননি। তাঁর স্ব র্ণসম্পুট বার্ষিক পত্রিকাটি সন্তোষবাবু বার দুই সম্পাদনা করেছেন। কলকাতায় থাকাকালে তার বাসা দেখে দেওয়া থেকে দীর্ঘদিন আমার সহকর্মী। হিতাকাঙ্ক্ষী তো বটেই। বণের কাছ থেকেই সন্তোষবাবু আমার লোকসেবকের সাব-এডিটরি এবং সাহিত্য পরিষদে আমায় ধরার জন্য বণকে পাঠিয়েছিলেন। বণ পরিষদে আমায় পায়নি।

— আপনি পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছেন?

— পদত্যাগ পত্র? পদই নেই, ত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না।

— আপনাকে আজই আনন্দবাজারে যোগ দিতে হবে। ঠিক একটায় আসুন অফিসে। হিন্দুস্থানে যে রকম কার্টুন দিচ্ছেন তার চেয়েও ভালো কার্টুন চাই। অশোকবাবু আপনার মতো একটি বাঙালি ছেলে চাইছেন।

একটি বাঙালি ছেলে চাওয়ার কারণ হল, কুট্টি আনন্দবাজারকে ধরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর অনেক বেশি বেতনে হিন্দুস্থান টাইমসে চাকরি পায়। অশোক সরকার তখন অসহায়। তাঁর অনুরোধে ঠিক হয়, কুট্টি হিন্দুস্থান টাইমসে যে কার্টুন আঁকবে তার নিচে Courtesy: Hindustan Standard লেখা থাকবে। অশোকবাবু প্রবল আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন লোক — এ রকম কম্প্রোমাইজ

করার পক্ষপাতী নন। কিছুদিন পর দেখা গেল, হিন্দুস্তান টাইমসে কুট্টির কার্টুন বের হচ্ছে কিন্তু নিচে ট্রঙ্গস্তুভ্জব্ধন্দ্বদ্দম্ভজ্ঞ ড্রন্দস্তুত্ত্বদ্দক্ক ত্রক্কস্তুত্রজস্তু লেখা থাকছে না। এটা কেবল সন্তানের বদলে বঙ্গ সন্তানকে চাকরি দেবার প্রস্তাব আসে। কিন্তু অশোকবাবুর এই বঙ্গ-

সন্তান-প্রীতি বছর তিন পরই বন্ধহয় গেল। কুট্টি ফিরে এল তার পূর্বস্থানে।

পরলোকগত মানুষের নিন্দা করা সৌজন্যসম্মত নয়। কিন্তু রাজনীতিবিদদের একান্ত ব্যাত্তিগত জীবনের বাইরে যে অংশটুকুপাবলিক, তার সমালোচনা, মৃত্যুর পরও দেশে বিদেশে করা হয়। চার্চিল জভেল্ট বা নেহে ইন্দিরার পাবলিক লাইফ নিয়ে নতুন নতুন তর্ক বিতর্ক আজও হচ্ছে। আনন্দবাজারে আমার রাজনৈতিক কার্টুন বন্ধ হবার মূলে এক রাজনীতিবিদের ভূমিকা ছিল। স্মৃতি খুঁড়ে বেদনা জাগাতে কেউ ভালোবাসে না। কিন্তু এ নিয়ে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানকে অনেকেই সেই সময় এবং তারও পরে সমালোচনা করেছে। আমার একটি নৈতিক দায় রয়েছে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে আনন্দবাজার তথা অশোক সরকারকে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুত্ত করা। কুট্টি কারণে-অকারণে অতুল্য ঘোষের কার্টুন নিয়মিত ছাপা হওয়ায় অতুল্য ঘোষের একটা ইমেজ গড়ে তোলায় সাহায্য হত।

সন্তোষবাবু চেষ্টা করতেন পত্রিকাকে একটু নিরপেক্ষ রাখতে। আমি কার্টুনে অতুল্য-বন্দনা কোনদিন করিনি। কুট্টি হিন্দুস্থান টাইমসে যোগ্য দিলেও সেখানকার সম্পাদক কার্টুনে অতুল্য-বন্দনা পছন্দ করতেন না। দিল্লির পত্রিকা চিরদিনই বাণিজ্য-মনস্ক, অশোক সরকারের মত সংস্কৃতিস্মন্য তাঁরা নন। কুট্টিরও সেখানে অসুবিধা হচ্ছিল। কুট্টি-অতুল্য কথাবার্তার খবর দিল্লী থেকে খগেন দে সরকার যখন দিলেন, আমি ঋাস করিনি। সন্তোষদা আমায় তাঁর ভবাণীপুরের বাড়িতে ডেকে পাঠালেন গেলাম।

তাঁর মুখ থমথমে। বললেন — তোমার বড় কার্টুন আর ছাপা যাবে না। অতুল্যবাবু চাপ দিচ্ছেন কুট্টিকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য। কুট্টি শর্ত দিয়েছে চণ্ডীর রাজনৈতিক কার্টুন ছাপা চলবে না। তুমি তির্যক করে যাও। আমি তির্যক এমন গুত্ব দিয়ে ছাপব যে সেটা পাঠকমনে অনেক গুত্ব পাবে।

এ ব্যাপারে অশোকবাবু অসহায়। অতুল্য বাবুর অনুরোধ এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। একালের সংবাদপত্রাদির নির্ভীক নিরপেক্ষ ও বেপরোয়া সমালোচনা দেখে পাঠক যেন ভাববেন না প্রাক-ইন্দিরা যুগে সংবাদপত্র এরকম সুখে ছিল। ভারতের সব সংবাদপত্রই দিল্লি থেকে রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রিত হত। নিউজ প্রিন্ট, বিজ্ঞাপন, এবং মুদ্রাযন্ত্রের যন্ত্রাংশ আমদানী ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করতেন। দিল্লিতে নিজেদের লবি না থাকলে বৈদেশিক মুদ্রা মিলত না। নিউজ প্রিন্টের বরাদ্দ কমে যেত। পত্রিকার দাম তার পৃষ্ঠা সংখ্যানুপাতে (প্রাইস পেজ সিডিউল) ঠিক করা হত। এটা পরোক্ষে সরকার নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞাপন সংবাদের হার সরকারবেঁধে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপন চল্লিশ এবং সংবাদ ষাট শতাংশ। এর বাইরে রোটারী মেশিনের যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা লাগে তাও সরকার নিয়ন্ত্রিত।

অতুল্য -মোরারজী-সঞ্জীব রেড্ডীদের সিণ্ডিকেট সারা ভারতের সংবাদপত্রগুলির ওপর ছড়ি ঘোরাতেন। ইন্দিরা সেই সিণ্ডিকেট ভেঙে দিয়ে কিছুদিনের জন্য সংবাদপত্রকে মুত্ত করেছিলেন। রিমোট কন্ট্রোলে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের এই ব্যাপার নিয়ে আজ পর্যন্তকোন সাংবাদিক এক লাইনও লেখেন নি। আমায় রাজনৈতিক কার্টুন আর করতে না দেওয়ার শর্ত চাপিয়েছিল কুট্টি। অতুল্যবাবু কেবল চেয়েছিলেন কুট্টি আনন্দবাজারে ফিরে আসুক।

প্রসঙ্গত বলে রাখি কুট্টির এইনিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সন্তোষবাবু এবং হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের ধীরেনবাবু আমার রাজনৈতিক কার্টুন মাঝে মাঝেই ছাপতেন। টেলিপ্রিন্টারে সংবাদ পড়ে অনেক সময় আমি তৎক্ষণাৎ কার্টুন করতাম। সংবাদ ও কার্টুন

একত্রে ছাপা হত।

আমার স্বার্থে ঘা লেগেছে বলেই অতুল্য ঘোষ জঘন্য লোক, এরকম তরল মন্তব্য আমি করব না। বরং প্রকৃত ঘটনা হল অতুল্যবাবু নিজে শিল্পীমনের অধিকারী ছিলেন। সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি আই. এফ. এর সভাপতি। খেলার জগতের দিকপালরা তাঁর উদার হৃদয়ে স্থান পেয়েছেন। তারাশঙ্কর, প্রমথনাথ বিশী প্রভৃতিরা যে রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন সেটা তাঁর সংস্কৃতিমনস্কতার ফল। সি. এল. টির সমর চাটুজ্জে তাঁর শিশু অভিনেতৃবাহিনী নিয়ে বারবার বিদেশ ভ্রমণ (বিদেশী মুদ্রারকঠোর নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও) করেছেন তার মূলেও ছিল অতুল্যবাবুর গোপন সাহায্য। সবচেয়ে বড় কথা, আজকের বাঙালিরা দিল্লিতে যে সম্মানের স্থান দখল করে আছে, তার মূলেও অতুল্যবাবুর পিতৃসুলভ অভিভাবকত্ব। শ্যামাপ্রসাদের পর অতুল্যবাবু দিল্লির বাঙালিদের সম্মান ও স্বার্থরক্ষার জন্য নিঃশব্দে সর্বাধিক কাজ করেছেন। কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছেন অনেকেই। কিন্তু খন্ডিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেউ কিছু করেন নি। অতুল্যবাবুর একটি যোগ্য ছেলে আছে। কোন দিন কেউ তার নাম সংবাদপত্রে দেখেননি। অথচ অন্যের যোগ্য ছেলেদের বিদেশে পাঠাবার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন এমন বহু ছেলের নাম আমি জানি।

শিবের গীত বন্ধ করে ধান ভানা শু করি।

অতুল্যবাবু খুব খুশি হতেন তাঁকে নিয়ে কার্টুন করলে। তাঁর নিন্দা-প্রশংসায় কন্টকিত অসংখ্য কার্টুনের ক্লিপিং তিনি সযত্নে রাখতেন। তিনি অকপটে স্বীকার করতেন (একমাত্র তিনিই) কাগজে কার্টুন প্রকাশিত হলে (তাতে নিন্দা-অসূয়া থাকলেও) রাজনীতিকদের ইমেজ বাড়ে। বন্ধুবর অমল চক্রবর্তী অমৃতবাজারে কার্টুন করার পাশাপাশি সাপ্তাহিক কার্টুন দেখে হাসতেন এবং সযত্নে রেখে দিতেন।

অতুল্যবাবু ছিলেন স্থূলকায়। একটি চোখ যৌবনে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কালো চশমা পরতেন। সেজন্য তাঁর কার্টুন আঁকা খুব সহজ ছিল। তাঁর চওড়া বুকের মত হৃদয়ের মাপও ছিল চওড়া।

অতুল্যবাবুর মতোই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়েরও ছিল সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। পিসিয়েলের কাছে শুনেছি ডাঃ রায়ের কোন কার্টুন প্রকাশিত হলে প্রায়ই মূল ছবি চেয়ে নিতেন। আমি তাঁর মুখোমুখি হয়েছি একাধিকবার। বিধানসভায় তাঁকে দেখেছি লোক- সেবকের পক্ষে রিপোর্টিং করতে গিয়ে। আনন্দবাজারে যোগ দিয়ে বিধানসভায় গিয়েছি মাত্র দু-একবার। একবার দুটি কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন, বউবাজার এবং বাঁকুড়া থেকে।সেবার বড় কার্টুন করেছিল কুট্টি। আমি পকেট-কার্টুন করেছিলাম।চিফ রিপোর্টার কুট্টির ও আমার কার্টুন (মূল ছবি) সংগ্রহ করেন ও ডাঃ রায়কে দেন। আমার কার্টুন সংগ্রহ করে আমায় কোনদিন সম্মানিত করেননি ডাঃ রায়। কিন্তু ছোট কার্টুন তির্যকে যে সব বিষয়ে তাঁর দপ্তরের বিভিন্ন মন্ত্রীকে খোঁচা দিতাম সেগুলি উপভোগ করতেন। দু-একজন রিপোর্টারের কাছে ফিড-ব্যাক মাঝে মাঝে পেয়েছি। হেম নস্করকে একদিন তিনি ডেকে বলেছিলেন — বিধান সভায় পান বিলি না করে ভাজা মাছ বিলি করলে, তুমিও বাঁচতে। রিপোর্টাররাও বাঁচত। এটা সকালের কাগজে আমার কার্টুনের প্রতিক্রিয়া। হেমদা আসার সময় বাড়ি থেকে অনেক পান বেশ কয়েকটি ডিবেতে পুরে নিয়ে আসতেন। বিরোধী পক্ষের এম. এল. এ, কয়েকজন মন্ত্রী এবং প্রবীণ কিছু রিপোর্টার সেই পান নিয়মিত চেয়ে নিতেন। জমিদারবাড়ীর পান। নানা রকম মশলায় সুগন্ধিত সেই চর্ব্যবস্তু একবার খেলে, আর একবার খেতেই হবে। হেম নস্কর সবার হেমদা, বয়সে অনেক কনিষ্ঠ আমারও হেমদা। রাজনীতির কোন মারপ্যাঁচ তাঁর ব্যবহারে ছিল না। যেহেতু মাছ বাঙালিরনিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সেজন্য মৎস মন্ত্রীকে প্রায়ই কার্টুনে আক্রমণ করতাম। রাগ করেননি কোনদিন। আমার কার্টুন দেখে, তাঁর বেলেঘাটার বাড়িতে ভাইপো ভাইঝি নাতি নাতনিরা তাঁকে নিয়ে মজা করতেন। নিজেই বলেছেন আমায় সে কথা। কিন্তু মুখে হাসি নিয়ে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে জ্যোতিবাবু সবচেয়ে শুষ্কং কাষ্ঠং। সাহিত্য সংস্কৃতির বোধ রাজনীতিবিদদের নাও থাকতে পারে। কিন্তু জ্যোতিবাবু কোনও সমালোচনাই সহ্য করতে পারেন না। একবার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করছেন (মনে হচ্ছে মিনার্ভায়), আমি স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছি সেখানে। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে তিনি সেদিনের আনন্দবাজারে প্রকাশিত কার্টুনের সমালোচনা করলেন। অজয়বাবুকে যেভাবে জ্যোতিবাবুর অনুগামীরা হেনস্থা করেছিল সেটা সভ্য সমাজের আচরণসম্মত নয়। এ নিয়ে কার্টুন করেছি এবং তাঁর সমালোচনা শুনেছি।

এরই বিপরীত মেতে ছিলেন প্রমোদ দাশ গুপ্ত। তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়নি। সাপ্তাহিক পরিবর্তনে (আমি আনন্দব

াজারে থাকতেই) বড় রাজনৈতিক কার্টুন দিতাম। একটি ছেলে তাঁর কাছে যাতায়াত করত। তাঁকে বলেছিলাম, কার্টুন দেখে প্রমোদবাবুর প্রতিত্রিয়া জানাতে। প্রমোদবাবু তাঁর সমালোচনা সত্ত্বেও কার্টুনের প্রশংসা করেছেন। একবার একটি ক ার্টুনে বিদেশি প্রভাব ছিল বলে জানিয়েছিলেন।

পাঠক শুনলে অবাক হবেন, বুর্জোয়া আনন্দবাজারের কার্টুনিস্ট চণ্ডীর সঙ্গে রাগী কমিউনিস্ট হরেকৃষ্ণ কোঙারের এক ব ারদেখা হয়েছিল রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজনে। বন্ধুবর কিশলয় ঠাকুর থাকেন নোনাপুকুরে, হরেকৃষ্ণবাবুর ডেরায়। সঙ্গ নিল াম। প্রথম দর্শনেইতাঁকে বললাম—আমার বাড়ি নবদ্বীপ। বৈষ্ণবদের দেশ। হরেকৃষ্ণ হরেকৃ ষ্ণ এই আমরা দিনরাত জপ করি।

শোনামাত্র রোগা লম্বা মানুষটি আমায় জড়িয়ে ধরলেন। হাসিমুখে। আনন্দবাজারকে অপছন্দ করলেও, তার সাংবাদিকর া সাধারণ ঘরের সন্তান। কোন অবস্থাতেই তিনি সাধারণ সাংবাদিকদের শত্রু মনে করেন না। — এই কথাটাই বারবার বললেন।

কুট্টির চাপে আনন্দবাজারে রাজনৈতিক কার্টুন বন্ধ হল। প্রথমে দুঃখ পেয়েছিলাম। পরে সাপ্তাহিক পরিবর্তনে শ্রীলাহিড়ী ন ামে প্রচুর কার্টুন করেছি। পরিবর্তনে কাজ করার আগে সন্তোষ বাবুর সম্মতি নিয়েছি। আমার বহু বিখ্যাত কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে সেখানে। প্রচারে, পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই, পরিবর্তন যখন এক লাখ পচিঁশ হাজারে পৌঁচেছে, সাপ্তাহিক দেশ তখন আশিহাজার ছোঁয়নি। ফলে প্রচার পেয়েছি খুব, প্রশংসাও। আজকের টিভি ও সংবাদপত্র জগতের অনেক খ্যাতিমান সাংবাদিকের হাতে খড়ি হয়েছিল পরিবর্তনে। তারা আমার গর্ব।

আগেই বলেছি ভালো কার্টুনিস্ট তৈরি হওয়াটা নির্ভর করে কার্টুনিস্টের কাজের পরিবেশের ওপর। আমার কাজের পরিবেশ অনুকুল হওয়ার জন্য যাদের অবদান ছিল তাদের কয়েক জনের কথা বলেছি। এবার বলব অমিতাভ চৌধুরীর কথা। আমি কাজে যোগ দেবার সময় অমিতবাবু সন্তোষদার সঙ্গে সহকারী বার্তা সম্পাদকের কাজ শু করেছেন। অমিতব াবু এবং আমি সম-বয়সী) এবং তণ বয়সের ধর্ম মেনে দুজনের মাথাতেই নানারকম আইডিয়া টগবগ করে ফুটত। অমিতব াবু কার্টুন এবং তার ক্যাপসন একবার দেখেই বুঝে যেতেন। কোনদিন তাঁকে কোনও কার্টুনের ব্যাখ্যা দিতে হয়নি। এমনও হয়েছে, আমার লেখা ক্যাপসন বাতিল করেছেন। কোন ক্যাপসনই দেননি। কার্টুন নিজেই কথা বলছে, অকারণ ক্যাপসন কেন?

সারাদিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডর্ড ও আনন্দবাজারের জন্য দুটি কার্টুন রোজ তৈরি করতে হয়। বিকেলের দিকে যখন কার্টুন তৈরি শেষ হত তখন আমি ক্লান্ত। মাথা তখন বিশ্রাম চাইত। অনেক সময়শ্লথগতি মননের ফলে স্মার্ট ক্য াপসন দিতে পারতাম না। অমিতবাবু সেই সব সংকটকালে আমার কার্টুনের ক্যাপসন ছেঁটে বা উন্নতি ঘটিয়ে, আমায় বাঁ চিয়ে দিতেন।

অনেকেই জানে না, বেশ কিছুদিন তাঁর এবং আমার মধ্যে একটি প্রাইভেট চ্যানেল ছিল। অমিতবাবুর প্রবল রসবোধ আম ায় এমন কিছু দুঃসাহসিক কার্টুন করতে উৎসাহিত করেছে যা বাইরে জানাজানি হলে, চাকরি না গেলেও, শত্রুবৃদ্ধি ঘটত। নন্দা-ঘুন্টি অভিযানে সব সংবাদ ভিতরের পাতায় ঠেলে দিয়ে প্রথম পাতা এমনভাবে সাজানো হত যাতে কাগজ পড়লে গড়পড়তা পাঠকের মনে হবে, বিশ্বে কোথাও কিছু ঘটেনি। এই কর্তাভজা নীতিতে আমি খেপে গিয়েছিলাম এবং অশোক সরকার এবং সন্তোষবাবুকে নিয়ে কার্টুন করতাম এবং সেসব কার্টুনে আমার প্রকৃত মনোভাব ফুটে উঠত। অমিতবাবু সেসব কার্টুন কোনদিন কাউকে দেখাননি। তবে সন্তোষবাবুকে মনে হয় দেখাতেন।

অমিত-সন্তোষের রসবোধ কত ধারালো ছিল, তার একটি উদাহরণ পেশ করি। আমি যে হাউসিং এস্টেটে বাস করি সেখ ানে বাগান করেছিলাম। সরকারী জমিতে বিনা অনুমতিতে বাগান। সংশ্লিষ্টি অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (পরবর্তী জীবনে প্রমে াটারি করে কোটিপতি) সেই বাগান ভেঙে দেন। বাগান ভেঙে দেওয়ায় আমার দুঃখ হল। প্রতিবেশীদের দুঃখ আরও বেশি। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস ও অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস নিজেরা রাইটার্সে গিয়ে এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ জা নিয়ে এলেন। দুই বিখ্যাত অধ্যাপকদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঐ ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি যেতে বসেছিল। তাকে শেষ পর্যন্ত ওয়ার্নিং দিয়ে সরকার ছেড়ে দেয়। বাগান করা সরকারী নীতি।

এর কিছুদিন পর আমি আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে রিজেন্ট এস্টেটে অমিতবাবুকে নিমন্ত্রণ করতে গেছি। অমিতবাবু

মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন, কত নম্বর বউ ?
অবাক হলাম প্রশ্ন শুনে। তিনি ড্রয়ার থেকে একটি চিঠি বের করলেন। সন্তোষ ঘোষ আগের দিন ডাকে আসা একটি চিঠি অমিতকে দিয়েছেন। চিঠির বয়ান মোটামুটি এরকম —
— আপনাদের অফিসের চণ্ডী লাহিড়ী আমার প্রতিবেশী। তিনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন। তাঁর ইতিমধ্যেই একটি বিবাহিত বৌ ও একটি রক্ষিতা আছে। গভীর রাত্রে যখন মদ্যপান করে তিনি ঘরে ফেরেন তখন তার চিৎকারে পাড়ার লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ইত্যাদি।
চিঠি পড়েই বুঝলাম, ঐ অ্যাসিট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। অভিযোগগুলি যে অসার ও অসূয়াপ্রসূত এটা চিঠি পড়েই সন্তোষদা বুঝতে পেরেছিলেন। অমিতবাবুর হাতে চিঠিটা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন— চণ্ডীর ক্ষমতা আছে। আনন্দবাজারে যা মাইনে পাই তাতে আমরা একটা বউ পুষতে পারিনা। আর চণ্ডী একটি বউ, একটি রক্ষিতা এবং আরও একটা বউ পুষতে যাচ্ছে। ওর পায়ের ধুলো নেওয়া উচিত। অমিতবাবু চিঠিখানি অতঃপর ছিঁড়ে ফেললেন।
আমাদের অগ্নিপরীক্ষা হল জরী অবস্থার সময়। সংবাদপত্রের ওপর কঠোর সেন্সার ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগতভাবে বহু সাংবা-দিক সি. আই. ডির নজরবন্দী। ফটো সংবাদ কার্টুন সবই সেন্সরের আওতায়। একদিন বাজারে খুব ছোট পুঁটি মাছের দাম হাঁকল পাঁচ টাকা কেজি। তি ন টাকার বদলে পাঁচ টাকা। জরী অবস্থায় ইন্দিরা ভরসা দিয়েছিলেন দাম বাড়বে না, অথচ পুঁটি মাছের দাম বেড়ে হল পাঁচ টাকা। সেই কার্টুন রাইটার্সে গেল এবং ফিরে এল। ছাপা যাবে না। অথচ পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় (মন্ত্রী তণ কান্তি ঘোষের কাগজ) পুঁটি মাছের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কার্টুন ছাপা হল। অমলের কার্টুন।
রেগে গেলাম খুব। তৎক্ষণাৎ আনন্দবাজারের প্যাডের কাগজে কড়া ভাষায় একটি চিঠি পাঠালাম। সরকারী সেন্সর ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে এটাই আমার অভিযোগ। একদিন পরেই অমিতবাবুর ঘরে ডাকলেন।
সেনস্র কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ (গোপাল ভৌমিক) সম্পাদক অশোক সরকারকে ধমক দিয়ে জানিয়েছেন, — তোমাদের কার্টুনিস্ট চণ্ডী যে চিঠি লিখেছে সেটা জরী অবস্থায় আইন বিদ্ধ। এরকম চিঠি যেন আর না আসে।
অশোকবাবু চিঠি পেয়ে অমিতবাবুকে ডেকে বলেন— চণ্ডী চিঠি লিখে অন্যায় করেনি। পক্ষপাতিত্ব হয়েছে এবং সেটা প্রমাণিত। তবু জরী অবস্থা চলছে। একটু সাবধানে যেন চলে।
গোপাল ভৌমিক একদা কৃষক পত্রিকার সাংবাদিক, কবি মানুষ। সমকালীন পত্রিকার সুত্রে আমার শ্রদ্ধেয় দাদা এবং মানুষটি সরলপ্রাণ। গুণীদের কদর করতে জানতেন। এটুকু বাড়াবাড়ি না করলেই পারতেন। এই ঘটনার জন্য পরে গোপালদা বহুবার আমার কাছে সমকালীন পত্রিকার অফিসে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ফাটা হাঁড়ি তো জোড়া লাগে না।
এর উল্টো দিকে ছিল প্রদীপ ঘোষ। সরকারী কর্মী। বিখ্যাত আবৃত্তিকার।
জরী অবস্থার সময় একদিন সোজা আনন্দবাজারে আমার ঘরে এসে হাজির। এসেই বললেন— অনেক পাপ করলে তবে সেনস্র অফিসার হয়। আপনার মতো গুণী মানুষের কার্টুন ছাপা হবে কিনা সেটা বিচার করছে আমার মতো একজন সামান্য মানুষ।
সেদিনের সেই দুঃসময়ে প্রদীপ ঘোষের মুখের এই সরল উক্তি আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল এবং পরবর্তীকালে সে আমার পরিবারের একান্ত আপনজন হয়ে গেছে। আমার কন্যা তার এই কাকুকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করে —এটা এখন অনেকেই জেনে গেছে। জরী অবস্থায় সিদ্ধার্থ রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকায় অত্যাচারের সব দায় তাঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী গনি খান তাঁর নিজের গায়ে কোনও আঁচড় লাগতে দেননি। চালাক মানুষ। অন্য দপ্তরের মন্ত্রীরা কেউ নিজে দেখে সেনস্র করতেন না। সই থাকত না কারও। কেবল not to be printed রবার স্ট্যাম্প মারা থাকত। শালকাঠের খুঁটি পুলিয়ার গ্রামে পোঁতা হয়েছে তারও লাগানো হয়েছে
কিন্তু বিদ্যুৎ আসেনি। আমি কার্টুন করলাম— সেই তারে গ্রামের মেয়েরা ভিজে কাপড় মেলেছে, রোদে শুকোবার জন্য। গনি আমার ছবি কোতল করলেন এবং তাঁর দপ্তরের যে অফিসার অফিসে এসে আমায় ছবিটি ফেরৎ দিয়ে গেলেন তাঁর ভাষা শুনে মনে হল তিনি হাতে ছুরি পেলে তখনই আমায় কোতল করে দিতেন। আনন্দবাজারের একজন রির্পোটার যে গনির নিজস্ব লোক হয়ে আছেন যার মারফৎ স্যার সব খবর পান— এটাও তিনি আমায় জানালেন। আনন্দবাজারের রিপোর্টারদের মধ্যে গনির নিজস্ব একজন টিকটিকি আছে এবং সে যে নিয়মিত গনির কাছে আমাদের আভ্যন্তরীণ নানা

খবর বানিয়ে রঙ চড়িয়ে পাচার করত এটা আমরা অনেকেই জানতাম। কিন্তু এক রহস্যময় কারণে মালিকরা ছেলেটিকে সহ্য করতেন এবং প্রশ্রয় দিতেন। গনির হাতে আমার এক ডজন কার্টুন কোতল হয়েছে।
জরী অবস্থায় গনি খান চৌধুরী চুড়ান্ত নোংরামিতে নেমেছিলেন এবং বিপদ আসন্ন বুঝে সিদ্ধার্থশংকরের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সরে পড়েছিলেন। রাজনীতির অতি সংকীর্ণ চোরাগলির বাইরে বহু বিখ্যাত মানুষকে দেখেছি, যাদের প্রত্যেকেই অ াজ লিজেন্ড।
যাদুকর পি. সি. সরকার অর্থাৎ প্রতুলচন্দ্র সরকারকে যখন প্রথমে দেখি আমি তখন স্কুলের ছাত্র। দেশভাগ তখনও হয়নি। নবদ্বীপ নামক অতি ক্ষুদ্র একটি শহরের এক সরল কিশোর পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। হাতে লেখা পত্রিকা বান্ধবে দেব সাহিত্য কুটিরের পূজা বার্ষিকীর ছবি নকল করে সেই পত্রিকাটি আমি অলংকরণ করেছিলাম। ম্যা জিক দেখার পরদিন তাঁকে সেই হাতে লেখা পত্রিকা দেখিয়ে তাঁর স্বাক্ষর নিয়েছিলাম পত্রিকার পাতায়। সেই কিশোরের কাছে যাদুকর সরকার বহু দুরের নক্ষত্র।
এর কয়েক বছর পর হিন্দুস্থান স্ট্যাট্রণ্ডার্ডের বার্তা সম্পাদক ধীরেন দাশগুপ্ত আমায় ডেকে পাঠালেন — যাদুকর পি. সি. সরকার আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। ধুতি পাঞ্জাবী পরা ফর্সা অতি সুদর্শন মানুষটি সেই যে আমার সঙ্গে সখ্যে আবদ্ধ হলেন আমৃত্যু সেই সখ্য অটুট ছিল। জাপানে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ টেলিপ্রিন্টারে পেলাম। কাগজে ছাপা হল সেই মৃত্যু-সংবাদ। তারও পরে পেলাম পি. সি. সরকারের চিঠি। মৃত্যুর আগের দিন শেষ চিঠিখানি আমাকেই লিখেছেন। সে চিঠি আজও বাইরের কাউকে দেখাইনি। তাঁকে ও তাঁর ম্যাজিকগুলি নিয়ে প্রচুর কার্টুন করেছি। নিউ এম্পায়ারে শো হলেই সামনের সারিতে আমার বাঁধা আসন ছিল।
একালের আর এক বিস্ময় নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরকে দু-তিনবার দেখেছি। তাঁর জীবনের শেষ পর্বে নিদাণ অর্থাভাবে এবং ততোধিক পারিবারিক অসহযোগিতার যন্ত্রণায় তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন। উদয়শংকর তখন গল্‌ফগ্রীনের বাড়িতেই থাকতেন। সি এম পি- ও-র সহযোগী প্রতিষ্ঠান ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের কিছু বিদেশী বিশেষজ্ঞ তখন কলকাতায়।
মিঃ জিলিনিস্কির স্ত্রী জেসিয়া আমার বান্ধবী। তাঁর বাড়ির স্টুডিওতে গভীর রাত পর্যন্ত আমি কাজ করতাম। জেসিয়ার সঙ্গে কানন দেবীর বন্ধুত্ব হয়। অভিনেত্রী সংঘের সভানেত্রী কানন দেবী জেসিয়াকে অনুরোধ করেন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সাহেব-মেম -দের কাছ থেকে কিছু টাকা চাঁদা তুলতে। চাঁদা উঠেছিল। কিন্তু উদয়শংকরের হাতে টাকা আমরা দিতে পারিনি। কেন পারিনি তা লিখতে হলে পরনিন্দায় নামতে হয়। সব বৃহৎ মানুষের, বিশেষত প্রতিভাবানদের পারিবারিক সম্পর্ক বড়ই জটিল। রাসেল, চার্লি চ্যাপলিন, আইনস্টাইন দাম্পত্য-জীবনের জটিলতায় কষ্ট পেয়েছেন। উদয়শংকরও ব্যতিক্রম নন। কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় দাম্পত্যের কতটুকুই বা বাইরে থেকে দেখা যায়। আমার মতো অতি সাধারণ মানুষ সেই জটিল সম্পর্ক নিয়ে মতামত প্রকাশ করে অজ্ঞাতসারে হয়তো কালিমালেপন করে ফেলব — সেজন্য বিরত থাকাই ভালে া।
নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাসবিহারী এভেন্যুতে তাঁর ভাই ক্ষীরোদ চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েছি। আমার বন্ধু কিশলয় ঠাকুর বহুদিন ধরেই বিভূতিভুষণ ও পথের পাঁচালী নিয়ে মৌলিক কাজ করছিলেন। এই সূত্রে আমি বহুবার কিশলয়ের সঙ্গী হয়েছি। নীরদবাবু পথের পাঁচালীর প্রথম পাঠক এবং প্রকাশক। সহযোগিতায় অবশ্যই ছিলেন সজনীকান্ত দাস। সজনীবাবু মারা যাবার পর বিভূতিভূষণের প্রথম জীবনের বন্ধু একমাত্র নীরদবাবু বেঁচে আছেন। তদুপরি তাঁর পা ন্ডিত্য ঋিব্যাপী।
কিশলয়বাবু বরিশালের লোক। তাঁদের বাড়িতে সংস্কৃত কলেজ ছিল। শান্তিনিকেতনের ছাত্র না হলেও বহুবার সেখানে গিয়েছেন, থেকেছেন। তাঁর শালীনতা বোধ উচচমানের। আমি নীরদবাবুর স্কেচ করছি একটি খাতায়। কিশলয়বাবু একথা সেকথার পর নীরদবাবুকে বললেন — বিভূতিবাবু সম্পর্কে কি ছু বলুন।
নীরদবাবু বললেন — বিভূতিবাবুর মেয়েছেলের রোগ ছিল। একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাশ দিয়ে যাচ্ছি সজনী আর আমি। দেখি বিভূতি পার্কের বেঞ্চিতে বসে চেয়ে রয়েছে কয়েকটা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের দিকে। চোখে পলক পড়ছে না। আমার ও কিশলয়ের কানে কে যেন গরম সীসা ঢেলে দিল। আমি জানি, এ শহরে নীরদবাবুর ভক্তমন্ডলীর সংখ্যা কম নয়। আমাদের প্রিয় লেখক বিভূতিভুষণের কোন গুণ তাঁর চোখে পড়ল না। কেবল মেয়েছেলের রোগের কথাটাই তাঁর মনে

পড়ল আমরা তাঁর পুত্রের বয়সী— শোভনতার জন্য আমাদের একথা বলা তাঁর উচিত হয়নি। বিশেষত বিভুতিভুষণ যখন পরলোকগত।

নীরদবাবু বেঁচে থাকতেই আমি এক অখ্যাত পত্রিকায় এই লজ্জাদায়ক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছি। সেদিন নীরদবাবু পথের পাঁচালীর পাণ্ডুলিপির ভাষা সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছিলেন, সে সব ছাপার অক্ষরে আনব না। গোবর ঘাঁটলে দুর্গন্ধ ছড়ায়।

আমার স্ত্রী-একবার বায়না ধরলেন, নিউ এম্পায়ারে শম্ভু মিত্রের 'পুতুল খেলা' দেখাতে হবে। বহু বছর পর শম্ভু মিত্র অভিনয়করছেন একদিনের জন্য। খুব ভোরে রওনা দিলাম। হলের সামনে লম্বা লাইন।

— আপনার ইঁট ?

— ইঁট ! আমি পুতুল খেলার টিকিট কিনতে এসেছি।

রহস্যের জট খুলল। অতি উৎসাহীরা মধ্যরাত্রি থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। অনেকে ইঁট পেতে রেখে চা খেতে গিয়েছেন। আমি লাইনে দাঁড়ালাম। আধ ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে প্রথম শীতের কাঁপুনি সহ্য করে অবশেষে ফিরে এলাম। সব টিকিট শেষ।

এর পর কয়েক বছর পার হয়েছে। গঙ্গা-পদ্মায় বয়ে গেছে অনেক জল। চড়াও পড়ে গেছে।

একদিন আবিষ্কার করলাম, আমি তো বটেই, আমার বৌ-মেয়ে ও শম্ভুদার আপনজন হয়ে গেছে।

শম্ভুদার সঙ্গে পরিচয়ের মূলে নান্দীকারের ভূমিকা অনেকটাই। দ্রপ্রসাদ, কুমার রায় ইত্যাদি সহ রিপোর্টারী করে (১৯৮০) শম্ভুদা অভিনয় করলেন 'মুদ্রারাক্ষস'। খুব কাছে তাঁকে দেখার সুযোগ হল। শুধুই দেখা। আলাপ পরিচয় নয়। নান্দীকারের তরফ থেকে পাঁচুগোপাল শম্ভুদার কাছে আমার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিল। অচিরে শম্ভুদা একদিন ফোন করলেন। আমার অবর্তমানে আমার পররাষ্ট্র দপ্তর সামলায় আমার স্ত্রী। শম্ভুদা বহু অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া বহুদর্শী মানুষ। আমার স্ত্রীর কথা শুনেই কোন অঞ্চলের মেয়ে বুঝেছিলেন। আমার স্ত্রীর মতে বাবা ও মেয়ের আলাপচারিতার মতো মাধুর্যমন্ডিত সেই টেলিফোনের আলাপ,বললেন, চন্ডিবাবুর আগে তোমায় নিমন্ত্রণ করছি আমার বাড়ি। তখন শম্ভুদা থাকতেন পার্ক সার্কাসে।

এরপর অনেকবার যোগাযোগ হয়েছে। আমি যেবার গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় কার্টুনের প্রদর্শনী করলাম শম্ভুদাকে তাঁর বেহালার বাড়িতে গিয়ে আমার স্ত্রী ও কন্যা নিমন্ত্রণ করে এসেছিল।

শম্ভুদা আসবেন বলে কথা দিয়েও কথা রাখেননি। আমারও একটু অভিমান হয়েছিল। প্রদর্শনী শেষ হবার পর বাড়িতে আসবেন রবিবার সকালে।

সত্যিই এলেন। সঙ্গে গৌতম হালদার (সিনিয়র) এবং নেসলসের ঘোষবাবু। সারা দুপুর আমার বাড়িতে থাকলেন এবং তাঁর জন্য ঘরে তৈরি নানাবিধ খাবারও খেলেন। সেটা বড় কথা নয়। আমার স্টুডিওর ঘরে বসে আমার পলিটিক্যাল কার্টুন আকুল আগ্রহ নিয়ে দেখলেন। আর এই সুযোগে স্টুডিওর নিভৃতে বসে অকপটে ব্যক্ত করলেন তাঁর রাজনৈতিক দর্শন।

আই. পি. টি. এ করতে গিয়ে শম্ভুদার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং কোন কোন কম্যুনিস্ট নেতাদের দ্বিচারিতায় তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। নাম ধরে ধরে তিনি দু একজন বাম নেতার গোপন কীর্তিকলাপ আমায় শোনালেন। শম্ভুদার বক্তব্য, আমরা থিয়েটার করতে চেয়েছিলাম, মন্ত্রী হওয়া লক্ষ্য ছিল না। থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে গণচেতনার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলাম। থিয়েটারকে কম্যুনিস্টরা রাজনীতিসর্বস্ব করে তুলেছিল। আবার অনেক কম্যুনিস্ট নেতা সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল। শম্ভুদার চি ছিল খুব মার্জিত। কথোপকথনের ভাষা ছিল খুব সংযত। বৃদ্ধ পিতামহ যেভাবে উত্তরপুষকে তাঁর উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে— শম্ভুদার গলায় ছিল সেই স্নেহমিশ্রিত কাঠিন্য। চেয়েছিলেন জাতীয় নাট্যমঞ্চ গড়তে। সব রাজনৈতিক দল সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু সব দলই চেয়েছিল অভিনেতা অভিনেতারা সেই দলের ঢাকটা পিটে নিক। অভিনয়ে যন্ত্র হিসাবে ঢাক লাগে। কিন্তু সেই ঢাক মঞ্চের ওপর থাকে না। পিঠে সর্বদা বড় ঢাক থাকলে, অভিনেতার বদলে ঢাকটাই বড় হবে। ঢাক অভিনেতাকে বাজাবে না অভিনেতা ঢাক বাজাবে?

রাজনীতির এই প্রাটি তুলে তিনি অপ্রিয় হয়েছিলেন। আপনাকে বলছি তার কারণ আপনি সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে কার্টুন

করেন। সেই স্বাধীনতাই আপনার জনপ্রিয়তার কারণ। শিল্পীর কাছে কাজের স্বাধীনতা মূল্যবান। কেন মঞ্চ ছেড়েছি সেটা আপনি বুঝবেন।

ব্যাপারটা আমার মতো করে লিখলাম। শম্ভুদার বাচনভঙ্গী ও শব্দ চয়ন তুলনারহিত। কথার ফাঁকে ফাঁকে সংস্কৃত সাহিত্যের বহু বাক্যবন্ধপ্রয়োগ করেছিলেন যা গভীর অধ্যয়নসাপেক্ষ।

নিজের খ্যাতির অহংকারে আমি যখন যথেষ্ট স্ফীত, তখন একটি দিনের অভিজ্ঞতায় আমার অহঙ্কারের বেলুনটা ফুটো হয়ে গেল।

নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবের একদিনের অঙ্গ ছিল চিকিৎসক সাংবাদিক সাহিত্যিকদের আলোচনা চত্র। কথা ছিল শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল গাঙ্গুলীরা আসবেন। হিমানীশ গোস্বামী যদি বা গেলেন, দাবা প্রতিযোগীতার অজুহাতে সরে পড়লেন। মঞ্চে একমাত্র সাংবাদিক কার্টুনিস্ট চণ্ডি লাহিড়ী। একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন পোস্ট মর্টেম/ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ মেডিকেল কলেজের এক বিখ্যাত ডাক্তার। সে সময় তিনি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এবং তাঁর বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় নাম। মঞ্চে তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। সেই বিখ্যাত ডাক্তারবাবু ঘোষণা করলেন, — আজ আমাদের এই আলোচনাচত্রে হাজির হয়েছেন দৈনিক বসুমতীর বিখ্যাত কার্টুনিস্ট চণ্ডী চ্যাটার্জী।

নীলরতনের ছাত্ররা ছুটে গিয়ে তাঁর কানে কানে প্রকৃত পরিচয়টা আবার বলে দিলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, — আমার ভুল হয়েছে। আমাদের সভায় হাজির হয়েছেন, যুগান্তরের সাংবাদিক চণ্ডীপদ হালদার।

নীলরতনের ছেলেরা আবার সংশোধন করে দিলেন। ডাক্তারবাবু উঠে বললেন, আবারও ভুল হয়েছে। এসেছেন যুগান্তরের কার্টুনিস্ট চণ্ডী চৌধুরী।

পাঠক, সত্য ঘটনা বললাম। এর পরে বাধ্য হয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটানো ছাড়া উপায় কি।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com